সংবাদ

তাং ... 13 APR 2014 ...
পৃঃ ...৬... কলাম ...৩......

সাত সতেরো

বিনা বেতনের প্রাথমিক শিক্ষা কতটা বিনামূল্যে(?)

হারাধন গাঙ্গুলী

বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রকৃত অর্থেই কি বিনামূল্যে? প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য কি কোন অর্থই খরচ করতে হয় না। যদি করতেই হয় তাহলে তার পরিমাণ কত? পরিমাণটা জানার পর তখন আর বলা যাবে কি প্রাথমিক শিক্ষা চলছে বিনা বেতনে এবং বিনামূল্যে?

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে- কেমন শিক্ষা চলছে সেখানে। লেখাপড়ার মান? বাহারি অনেক সংস্কারই তো হলো। পিএসসি, জেএসসি, জেডিসি। রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনীর মতো রাজার নিন্দুক ভাগ্নে যেমন জিজ্ঞাসা করেছিল, মহারাজ পাখি কী শিখেছে তা দেখেছেন কি। ঠিক তেমনি প্রাথমিক স্তর শেষ করা কোন শিক্ষার্থীকে একটু বাজিয়ে নিলে কি দেখা যাবে?

প্রাথমিক শিক্ষকরাই বা কেমন আছেন তাদের পেশাজীবনে। তাদের বেতন কাঠামো কিংবা দীর্ঘ চাকরি শেষে একটি সম্মানজনক অবস্থানে তারা যেতে পারেন কি। আছে কি তার কোন নিশ্চয়তা। সব প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক।

বিনা বেতনে বা শিক্ষার্থীরা কোন টাকা-পয়সা খরচ না করে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে তা আদৌ ঠিক না। তাদের টাকা খরচ করতে হয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও তারা বৈষম্যের শিকার।

এই তথ্যটি উদ্ঘাটন করেছে খোদ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)। ইউনিসেফ এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ডিপিইর সঙ্গে যৌথভাবে একটি সমীক্ষা চালায়। 'দ্য স্টাডি অফ বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড- এ কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট' এই শিরোনামে সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়।

যদিও প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে তারপরও দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বছরে ৩ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করছে। এতে করে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী গড়ে ৪ হাজার ৭৮৮ টাকা ব্যয় করছে। যার ৫৪ শতাংশই চলে যায় প্রাইভেট পড়ার ব্যয় হিসাবে।

২০১৩-এর হিসাব মতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮ লাখের মতো।

প্রাইভেট পড়ার জন্য শহরের শিক্ষার্থীদের বেশি ব্যয় করতে হয়। সেখানে মোট ব্যয়ের ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশই চলে যায় প্রাইভেট পড়ার পেছনে। এখানে সবচেয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ব্যয় করতে হয় মোট ব্যয়ের ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ। মধ্যম দরিদ্রদের ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ। এই কি বিনা বেতনে পড়ার নমুনা?

যেটি দুর্ভাবনার তা হলো, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের সিংহভাগ চলে যায় গাইড বই কিনতে। বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই এ ক্ষেত্রে বেশি চাপে থাকে। কারণ শিক্ষকরা গাইড বই কিনতে তাদের বাধ্য করেন, জরিপে এই তথ্যটিও উঠে এসেছে। দেখা গেছে, সর্বোচ্চ গরিব শিক্ষার্থীদের তাদের ব্যয়ের ১০ দশমিক ৩ শতাংশই চলে যায় বিভিন্ন গাইড বই ক্রয়ের পেছনে। এতে তুলনামূলক বিচারে শিক্ষার্থীদের গরিব অংশই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এগুলো ছাড়া যেসব কারণে ও সময়ে শিক্ষার্থীদের অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা হলো ভর্তির সময়ে পরীক্ষার ফি বাবদ, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময়ে, বার্ষিক মিলাদ ও সরস্বতী পূজায় ইত্যাদিতে। এখানে তথ্যের একটু হেরফের থাকতে পারে এবং স্কুল বিশেষে পার্থক্যও থাকতে পারে। তবে মৌলিক চিত্রটি সারাদেশে একই।

তাহলে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার দাবি কতটা যৌক্তিক। এটাই বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে কিন্তু বিনামূল্যে নয়। এখানেও তুলনামূলকভাবে গরিব শিক্ষার্থীর পিতা-মাতারা বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। হতে বাধ্য হচ্ছেন।

আর প্রাথমিক শিক্ষার মান? সেই চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। বেশি দূর যেতে হবে না। খোদ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নেই স্বীকার করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তর অতিক্রম করেছে শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশই লিখতে, পড়তে বা গণনা করার ক্ষমতা রাখে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছর কাটানোর পরও শিক্ষার্থীদের ৬৯ শতাংশই ভালো করে বাংলা পত্রিকার শিরোনাম পড়তে পারে না। ৮৭ শতাংশ সাধারণ যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ করতে পারে না। এ নিয়ে কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিক শীর্ষ খবর পর্যন্ত প্রকাশ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত কোন সংগঠন প্রকাশিত খবরের কোন প্রতিবাদ করেনি।

প্রাথমিক অধিদফতর ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ পিউপিল এই শিরোনামে মূলত তৃতীয় ও পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের মানের ওপর জরিপ চালিয়ে উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ করে।

এছাড়াও দাতাদের অর্থায়নে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডি-২) অধীনে আরও একটি জরিপ হয়। সেখানেও বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা স্তর সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের ৭২ শতাংশই এক খণ্ড বাংলা কম্পোজিশন লিখতে অক্ষম। এদের ইংরেজি জ্ঞান আশঙ্কাজনকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

এই যদি হয় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমানের অবস্থান, তা হলে এর এত কাঠামোগত পরিবর্তন করে লাভটা কি হচ্ছে সেটাই ভাবা দরকার। অথচ শিক্ষার ভিত্তি বা বুনিয়াদ গড়ে ওঠে এই প্রাথমিক স্তর থেকেই। যাকে ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শিক্ষা ও পেশা জীবন নির্ধারিত হয় এবং গড়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষকরাও মানের এই ক্রমাবনতির কথা অস্বীকার করেন না। তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এটা বোঝা গেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর তারাও সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং প্রশিক্ষণের অগ্রগামিতা ও তার প্রায়োগিক দিকটির বিরাজমান যে ফারাক রয়েছে সেটাও তারা উপলব্ধি করেন। কিন্তু মূল কথা হলো, হচ্ছে না কিছুই। এ নিয়ে শিক্ষকদেরও স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, রয়েছে কর্মসূচিও। কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তারাও চান শিক্ষার উন্নতিটা কার্যকরভাবে হোক। উন্নতি কর্মকর্তার শুধু একটি ফরম পূরণের মধ্যে তার যথার্থ উন্নতির কাজ যেন শেষ হয়ে না যায়।

পিটিআই ও ইউআরসিগুলো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কার্যকরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা নিবিড় পর্যবেক্ষণের গুরুত্বও শিক্ষকরা স্বীকার করেন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখতে অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের গুরুত্ব নিয়েও শিক্ষকদের কোন দ্বিমত নেই। তারপরও কিছুই হচ্ছে না এটাই সত্য।

লেখাপড়ার মান সমুন্নত রাখার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখানে আমাদের একটা প্রস্তাব হলো, ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং করপোরেট হাউসগুলোর যে সিএসআর বরাদ্দ রয়েছে সেখান থেকেই স্কুল ফিডিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ব্যয়টা নির্বাহ করা যেতে পারে সাংবাৎসরিক ভাবে এখানে দাতাদের ভূমিকাও থাকতে পারে। তবে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি অব্যাহত রাখতেই হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এই উপলব্ধি এসেছে। বর্তমানে ৪৯ শতাংশ স্কুল ফিডিং চলছে। এতে অবশ্যই শতভাগে নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান যে ভয়ঙ্কর স্তরে নেমে গেছে তা রোধ করতে হলে অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে এই স্কুল ফিডিং চালু রাখতেই হবে। এ কারণেই জাতীয় সর্বাধিক অগ্রাধিকার হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচিকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষা হবে না।

একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান যে কাণ্ডারি সেই শিক্ষকরাও পেশাজীবনের নানা বৈপরীত্যের এবং বৈষম্যের শিকার। অর্থাৎ শিক্ষকরা যদি তাদের মানের উৎকর্ষতার প্রমাণ দিয়ে পেশাগতভাবে উপরে ওঠার সুযোগ না পান বা সুযোগ না থাকে তাহলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তারা প্রণোদনা পাবেন কোথেকে। এখানে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা চলছে। প্রাথমিক শিক্ষকরা পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক হতে পারেন না। প্রধান শিক্ষক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এতে করে শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও একঘেয়েমি দেখা দিতে বাধ্য। যে কোন প্রাথমিক স্কুলের ওপর একটু পর্যবেক্ষণ করলেই এটা লক্ষণীয়। শিক্ষকরা যেন গড্ডালিকা প্রবাহে চলছেন। যেন যান্ত্রিক। এটা কাটানো দরকার।

সুতরাং সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রথা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকরা যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ সাপেক্ষে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক হবেন এটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক।

শিক্ষক যদি মনে করেন তার প্রধান শিক্ষক হওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই নির্ধারিত যোগ্যতা থাকার পরেও, তাহলে পাঠদানে তিনি তার আগ্রহ ও আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলবেন। এখন অনেক ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যকার বেতন বৈষম্যও এখন প্রকট। আগে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতন কাঠামো একধাপ নিচে ছিল। এখন ফারাক তিন ধাপ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটাও প্রাথমিক শিক্ষকদের হতাশার একটি প্রধান কারণ। এখানে বেতন কাঠামোর পার্থক্যের বিষয়টি অবশ্যই একটি যৌক্তিক কাঠামোতে রাখতে হবে। যেখানে শিক্ষকদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হবে।

শুধু তাই নয়, বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক থেকে ডিডি পর্যন্ত পদোন্নতি পাওয়ার অধিকার ও সুযোগও নিশ্চিত করা দরকার শিক্ষকদের জন্যে।

মোট কথা প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব শুধু বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ রাখলেই হবে না। যত আয়োজন, কাঠামোগত সংস্কার যত কিছুই হোক, ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী যদি লিখতে, পড়তে এবং গণনার ক্ষমতা না রাখে তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের কোন স্তরে রয়েছে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। বিষয়টি যে দুর্ভাবনার, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার পর্যায়ে গেছে, সে সম্পর্কে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের চিন্তা করতে হবে গভীরে।

একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরও গুণগতমানে, আধুনিক মনস্কতায় এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যান্ত্রিকভাবে হীনম্মন্যতায় ভুগলে চলবে না। তাদের ধরাবাধা একটি টাইপড জীবন প্রণালী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পশ্চিমা জগতে সবচেয়ে আলোকিত মানুষরাই শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানে জড়িত থাকেন। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকদেরও তথা সব স্তরের শিক্ষকদের এভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দীর্ঘ সীমাবদ্ধতায় গড়ে ওঠা গতি জীবন ও জীবনবোধ ভাঙতে হবে।

একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েরও নানাভাবে শৈথিল্য রয়েছে। রয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নাক উঁচা ভাব। কিছুদিন আগে একটি সহযোগী দৈনিক লিখেছে, যথাযথ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও সময়মতো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না থাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তত চারটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষের জন্ম দিচ্ছে। নিয়োগ, পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করতে গিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'শিক্ষক পুল' নির্বাচন। লম্বা ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের স্থলে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নিয়ে ১৫ হাজার তরুণকে নির্বাচন করা হয় দু'বছর আগে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের নিয়োগ দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে এদের অনেকের চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে।

২৩ হাজার রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের প্রায় এক লাখ শিক্ষক সরকারি স্কেলে বেতন পান না। আবার রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ এবং প্যানেলভুক্ত প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষককে চাকরিতে নেয়া হচ্ছে না। পাঁচ বছরের মধ্যে উপজেলায় পদ শূন্য হওয়া সাপেক্ষে তাদের নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। বিদ্যালয় সরকারি করার পর এখন তাদের নেয়া হচ্ছে না। অথচ এর মধ্যে অনেকেরই চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে।

প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা বাড়ানো হলেও তাদের বেতন স্কেল সমন্বয়ের কথা হয়নি। আবার সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নিচে স্কেলে বেতন পেলেও এখন তাদের স্কেল তিন ধাপ নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে। উল্লিখিত এই অসঙ্গতিগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত অবস্থান গ্রহণযোগ্য মানে ধরে রাখার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। একটির সঙ্গে অপরটির অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং বিষয়টির সমাধানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবহেলা ও অযোগ্যতা স্পষ্টতই দৃশ্যমান। এ প্রসঙ্গেই গোটা বিষয়টি আমরা সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের দৃষ্টিতে আনতে চাই। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্বেগজনক অবনমনের কথা ভেবেই কালবিলম্ব না করে দ্রুতই পদক্ষেপ নেয়ার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি।

একমাত্র কাঠামোগত সংস্কার দিয়ে এই অবনমন ঠেকানো যাবে না। এখানে শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময়-সূচি, বিদ্যালয়ের কাঠামোগত অবস্থান, শিক্ষকদের গুণগতমান, তাদের চেতনার স্তর এবং তা এগিয়ে নেয়ার সুযোগ ও কর্মসূচি, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োগযোগ্যতা, শিক্ষক মর্যাদা সমুন্নত রাখা, তাদের পেশাগত অধিকারে বৈষম্য কার্যকর উন্নতি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা- এসব কিছুকেই আমলে করতে হবে একই সঙ্গে। পাশাপাশি স্কুল ফিডিং অব্যাহত রাখার সার্বিক উদ্যোগও এর সঙ্গে থাকতে হবে সব স্কুলেই স্কুল ফিডিং নিশ্চিত করতে [illegible] বলতে এর বিকল্প নেই।

একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের [illegible] বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে অন্যদিকে প্রাইভেট পড়া ও গাইড বই কিনতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য নেতিবাচক ভূমিকা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদেরকেও আলোকিত হতে হবে আধুনিক মানে। তাদের জীবনধারা, উদার, মুক্ত, আধুনিকমনস্কতা, নাগরিক বোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা যেন শিশু মনকে অনুরণিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে। তাহলেই একটি আলোকিত জাতি পাব আমরা।

প্রাথমিক শিক্ষার বৈষম্যই যদি বাড়ে তা হলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে লাভ কি।

gharadhan@gmail.com